সম্পাদকের খাতা

তোমাদের মধ্যে কেউ কখনও গোরুর গাড়ি চড়েছ? কেউ কখনও নৌকোয় চড়েছ? কিংবা বাঁশের ভেলায়? কিংবা দূর সাগরের জাহাজে?

বাসে ট্রেনে তো সবাই চড়ে, বেড়াতে গিয়ে দার্জিলিংয়ের ম্যালে ঘোড়ার পিঠে কিংবা রাজস্থানের বালিয়াড়িতে উটের পিঠেও অনেকেই নিশ্চয়ই চড়েছ।

কিন্তু কেউ কখনও ট্রেনে চড়ে লম্বা রেলগাড়িটা সমেত জাহাজে উঠেছ কি?

কিংবা গাছের বড় বড় ডাল বেঁধে, তাতে পাল খাটিয়ে দিশি ক্যাটামেরনে চড়ে সাগরে ভেসে পড়েছ কেউ?

আবার, গাছের মোটা গুঁড়ির মাঝখানটা কেটে পুড়িয়ে বা চেঁছে ফেলে বানানো ডিঙি নৌকো বা ডোঙা দেখেছ তোমরা? কেউ কি সে নৌকোয় চড়েছ কখনও?

এই প্রশ্নগুলোই যদি আমাকে করো, তাহলে আমার উত্তর—

এক, গোরুর গাড়িতে চড়েছি কিনা।

থাইল্যান্ডের চিয়াং-রাইয়ে গোরুর গাড়িতে চড়েছি। বিরাট চেহারার এক জোড়া গোরু যখন গ্রামের উঁচু-নিচু পথে ঘোড়ার মতো দৌড়য়, তখন সেই হাড়ভাঙানি ঝাঁকুনির কথা ঠিক বলে বোঝাবার নয়।

দুই, নৌকোয়।

ছোটবেলায় দাদুর সঙ্গে ভোরে ছই তোলা নৌকোয় শ্রীরামপুর থেকে বৈদ্যবাটি গেছি বেশ কয়েক বার।

তিন, বাঁশের ভেলায়।

বাঁশের ভেলায় চড়েছি পার্বত্য থাইল্যান্ডের প্রবল স্রোতের পাহাড়ি নদীতে। তীরের ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে হাতির পালও সেই নদীতে সাবধানে শুঁড় নামিয়ে জল খাচ্ছে দেখে আমি তো ভেলার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে ছবি তুলতে লেগেছি, একটু পরেই এক জায়গায় পাহাড়ি নদী উঁচু থেকে নীচে ঠিক যেন ঝপাস করে ঝাঁপ দিল, সেই খানে ভেলার এক ঝাঁকুনিতে আমি হুমড়ি খেয়ে নদীতে পড়তে পড়তেও কীভাবে শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলাম সে কথা বলতে গেলে আলাদা একটা গল্প হয়ে যাবে।

চার, দূর সাগরের জাহাজে।

পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষিণের শহর আর্জেন্টিনার উশুয়াইয়া থেকে জাহাজে আন্টার্কটিকা গিয়েছিলাম। আবার, পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের শহর হ্যামারফেস্ট থেকে সুমেরু সাগর পেরিয়ে নিশীথ সূর্যের দেশ নরওয়ের মধ্যযুগের রাজধানী বার্গেন পৌঁছেছিলাম, সে ছিল পাঁচদিনের সমুদ্রযাত্রা।

পাঁচ, ট্রেনসুদ্ধু জাহাজে।

জার্মানির বার্লিন থেকে যাব সুইৎজারল্যান্ডের ইন্টারলাকেন, সেখান থেকে

চিরপ্রাচীন বরফের জমাট-বাঁধা সুদীর্ঘ গ্লেসিয়ারের ছবি তুলতে পরদিন ট্রেন বদলে বদলে পৌঁছতে হবে ইউরোপের সর্বোচ্চ রেলস্টেশন ইয়ুংফ্রাওয়ে। ট্রেনে বসে ইয়ুংফ্রাওয়ে যাবার পাহাড়ি রেলপথের কথা ভাবছি, হঠাৎ কামরার মধ্যে স্পিকারে ঘোষণা শুনলাম, ট্রেন এবার জাহাজে উঠবে। সাগর পাড়ি দেবে। জাহাজ তীরে না পৌঁছনো পর্যন্ত ট্রেন জাহাজেই থাকবে।

আমি তো অবাক। ট্রেন আর চলছে না, এদিকে জাহাজ সাগরের বুকে চলেছে তো চলেইছে। ট্রেন জাহাজে ওঠা মাত্র সুটকেশ ট্রেনের কামরায় রেখে শুধু ক্যামেরা নিয়ে আমি কামরার বাইরে এসে দেখি জায়গাটা জাহাজের পাটাতনের মতো, এক ধারে উঁচু ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে।

সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলার ছাদে উঠে মন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। চারদিকে অসীম সমুদ্র।

এই পাঁচতলাতে জাহাজের কাফে বা ছোট্ট রেস্তোরাঁ। শুনলাম এখানেই দুপুরের খাওয়া সেরে নিতে হবে। আমি জাহাজের ছাদে উঠে ছবি তোলায় এতই ডুবে গিয়েছিলাম, যে 'জাহাজ এবার তীরে ভিড়বে, ট্রেন সমুদ্রযাত্রা শেষ করে আবার মাটিতে রেলপথে ছুটবে' —মাইকের এই ঘোষণাটা প্রথমে শুনতেই পেলাম না। দু-তিন বার বলার পরে যেই-না ঘোষণাটা কানে গেল অমনি কোনও রকমে আগুন-গরম ফিশ ফ্রাইয়ে জিভ পুড়িয়ে হুড়মুড় করে নেমে এসে এক লাফে চড়ে বসলাম ট্রেনে।

ছয়, ক্যাটাম্যারানে সাগরবিহার।

কয়েকটা গাছের গুঁড়ি একসঙ্গে বেঁধে তার ওপর একটা মস্ত পাল খাটিয়ে প্রাচীন কাল থেকে সিংহলীরা সমুদ্রে যাবার জন্য ক্যাটাম্যারান বানায়। স্বামী বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' বইয়েও আছে, 'উড়িষ্যা পর্যন্ত কট্টুমারণ (Catamaran) দেখেছ তো? ভেলা কেমন সমুদ্রেও দূর দূর পর্যন্ত চলে যায় দেখেছ তো?'

সেই ক্যাটাম্যারানে বসে পায়ের ফাঁক দিয়ে নীচে চোখ পড়লেই দেখবে সমুদ্র তোমার সঙ্গে কেবলই খেলতে চাইছে। চারপাশ থেকে অবিরাম ঢেউ ছিটকে উঠে তোমাকে সমুদ্র স্নান করাবেই। শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোর বিশ-ত্রিশ মাইল দূরে নেগম্বো সমুদ্রসৈকত থেকে আমি ওই ক্যাটাম্যারান চড়ে মহানন্দে সাগরযাত্রা করেছি। সে যাত্রার রোমাঞ্চ সমুদ্র থেকে এত দূরে বসে আমি বোঝাতেও পারব না, তোমরা বুঝতেও পারবে না।

সাত, ডিঙি নৌকো।

আমি চড়েছি আমাজনে। সেখানে এরকম এক-গুঁড়ির নৌকোকে বলে উবা।

আমার যত রকম যাত্রার কথা তোমাদের দুয়েক লাইন করে শোনালাম, তার যে-কোনও একটা-দুটো বা সবগুলো মনে মনে ভেবে নিজের মতো করে একটা গল্প লিখলে কেমন হয়? গরমের ছুঁটিতে একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি? যদি লেখো, আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিও। যাদের গল্প ভালো হবে তাদের গল্প 'ছেলেবেলা'য় ছাপা হবেই।

ছুটি মানেই তো রোজকার রুটিন থেকে মুক্তি। ছুটি মানে এক রকমের স্বাধীনতা।

ছুটিতেই তো মনের মতো বই পড়ার মজা। মনের মধ্যে ডুবে ভেসে গল্প ছড়া লেখার আনন্দ।

ছুটির সেই আনন্দ চারদিকের আলোয় হাওয়ায় ভরিয়ে দিতেই এই 'ছেলেবেলা'-র 'ছুটি সংখ্যা'।

'ছেলেবেলা', মে ২০১৪

সম্পাদকের খাতা

আজ তোমাদের সন্তোষমাঝির কথা বলব। জুনপুটে বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগরের উথালপাথাল ঢেউয়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার মতো তার নৌকো বাওয়া মনে হয় যেন এই সেদিনের কথা। আসলে প্রায় ৪০ বছর আগের ঘটনা। সন্তোষমাঝির সঙ্গে সামান্য একটা জেলেনৌকোয় সাগরে ভেসে পড়ার সেই ঘটনা বড়দের বলেছি, তোমাদের বলা হয়নি।

ট্রেনে হাওড়া থেকে খড়্গপুর, সেখান থেকে বাসে কাঁথি পৌঁছতে বেলা শেষ হয়ে এল। কাঁথি থেকে রিকশায় ডানদিকের রাস্তায় ছ'কিলোমিটার গিয়ে জুনপুটে যখন পৌঁছলাম তখন চারদিকে সন্ধ্যা হব-হব ভাব।

রাস্তার ধারেই বহু পুরনো একটা বাংলো দেখে তার পাহারাদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ভেতরে ঢুকে চক্ষু চড়কগাছ। যেমন উঁচু, তেমনই বিরাট ঘর, কিন্তু তার দরজা-জানলায় পাল্লা নেই, জানলার গরাদও কেউ খুলে নিয়ে গেছে! রিকশাওলা তখনও আমার সঙ্গেই ছিল। আমার দুর্দশা দেখে তার ছেঁড়া শার্টের পকেট থেকে একটা চাবি বের করে বহু দূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওই আমার বাড়ি। আপনি কষ্ট করে রাতটা আমার বাড়িতে থাকবেন? আর-একটা ট্রিপ দিয়ে-ই আমি ফিরব।'

শেষ পর্যন্ত দরজা-জানলাহীন বিরাট সেই বাংলোতেই উঠলাম। কোথাও কোনও খাবার দোকান নেই, পাহারাদারের কাছেও কিছু পাওয়া গেল না, ভোরবেলা জুনপুটের সমুদ্রে বিরাট সূর্যোদয় দেখবার কথা ভাবতে ভাবতে যতই ঘুমোবার চেষ্টা করি, একটু পর পর কাছেই কোথাও বিকট আওয়াজে তন্দ্রা কেটে যায়। কখনও ভূতের স্বপ্ন দেখি, কখনও মনে হয় ডাকাত পড়েছে। রাত ১টা-২টো অব্দি এইভাবে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে বেলাভূমি পেরিয়ে সমুদ্রের দিকে এগোতে লাগলাম।

অনেক দূরে এক ঝাঁক জোনাকির আলো। সমুদ্রের কাছাকাছি হয়ে বুঝলাম, জোনাকি নয়, সাগরতীরে নোঙর করা কতগুলো নৌকোর আলোকে জোনাকি ভেবেছিলাম। সমুদ্রে জোনাকি আসে না সে কথাও আমার মনে পড়েনি। নৌকোগুলো তীরছোঁয়া ঢেউয়ে দুলছিল।

সবই জেলেনৌকো। ভোরবেলা সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবে, এখন তারই প্রস্তুতি। এদেরই একজনের নৌকোর মাঝিকে শেষ পর্যন্ত রাজি করিয়ে নৌকোয় চড়ে বসলাম। আমি যাচ্ছি বলে একজন গিয়ে তীরের একমাত্র দোকান থেকে একটুখানি ডাল কিনে নিল। দোকানটা শুধু এই জেলেদের জন্যই রাতে খোলা থাকে। আমার মতো 'মান্যগণ্য অতিথি'কে তো আর ওদের মতো শুধু মাছ খেতে দেওয়া যায় না।

তাই ডাল কেনা।

লাজুক হাসি নিয়ে কথাটা যে বলল, সে-ই সন্তোষমাঝি।

সেবার জুনপুটের সমুদ্রসৈকতে পুব-আকাশে আগুন লাগানো সূর্যোদয় দেখে ভেবেছিলাম ঘোড়া ছুটিয়ে গেলে আমিই ওই অপরূপ আলোর উৎসব ছুঁয়ে দিতে পারি!

একটু পরেই সব ক'টা নৌকো যাত্রা শুরু করল। সমুদ্রের অনেকটা ভেতরে গিয়ে ভোরের কড়া আলোয় অনেকক্ষণ ধরে নৌকোগুলোকে কী একটা কৌশলে এক-একটা জায়গায় স্থির ভাবে দাঁড় করাল, তারপর শুরু হল সমুদ্রে জাল নামানো।

প্রথম দুয়েকবার জালে পারশে মাছের মতো মাছ উঠতে লাগল। দুয়েকটা জেলিফিশও উঠল, সেগুলো কাঠি দিয়ে ধরে আবার সমুদ্রেই ফেলে দেওয়া হল।

প্রথম ধরা-পড়া মাছ দিয়ে নৌকোয় মধ্যাহ্নভোজনের নিয়ম। ভাত আর মাছ, তেলমশলা ছাড়া মাছের ঝোল। ভাজাও খুব সামান্য তেলে।

রান্না করছে সন্তোষমাঝির শ্যালক। সে সারা বছর যাত্রাপালায় গান গায়। এ বছর তার দিদি তাকে ভগ্নীপতির সঙ্গে সমুদ্রে পাঠিয়েছে কাজ শিখতে।

সন্তোষ ও অন্যান্য মাঝিরা যখন নৌকো সামলে জাল ফেলতে-তুলতে ব্যস্ত তখন সন্তোষের এই শ্যালক রান্নার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে নানা পালার গান গেয়ে শোনায়। কী ভেবে মাঝে মাঝে বলে, 'আপনার মতো বড়মানুষের এসব কি আর ভালো লাগবে? আমরা বাবু ক্ষুদ্র মনিষ্যি।'

এই 'ক্ষুদ্র মনিষ্যি' কথাটা অনেক বছর পর 'হীরু ডাকাত'-এর গল্পে আমার কাজে লেগেছিল।

সন্তোষমাঝির বীর যোদ্ধার রূপ দেখেছিলাম দিনের শেষে। সাগর জুড়ে তখন ঢালাও সূর্যাস্তের রং। সন্তোষ নৌকোর এক মাথায় সেনাপতির মতো দাঁড়িয়ে বড় বড় এক-একটা ঢেউকে 'আয়! আয়!' বলে যুদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছে আর দু'হাতের কব্জির জোরে হাল মুচড়ে মুচড়ে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে।

আগের রাতে ডাল কেনবার সময় মান্যগণ্য অতিথির জন্য তার লাজুক হাসি আর এখন দিনের শেষে এই বীরের হুংকার সাধারণ মানুষের মুখকেও কত অসাধারণ সৌন্দর্যে ভরিয়ে দেয়, জুনপুটের জেলেনৌকোয় সেই সাগরযাত্রায় নিজের চোখে তা দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

সন্তোষমাঝি আমাকে এই সাগরের বুকেই একটা দূর দ্বীপের কথা বলেছে। শীতকালে সেখানে হাজার হাজার পাখি আসে। সমুদ্রও তখন শান্ত। সামনের শীতেই সে আমাকে সেই দ্বীপে নিয়ে যাবে।

সেদিন চলে আসবার সময় বারবার বলেছে, 'ঠিক আসবে তো তুমি? এই শীতেই তোমাকে পাখির দ্বীপে নিয়ে যাব। আসবে তো?'

'আসব।'

আর যাওয়া হয়নি ভেবে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। দূর দ্বীপে পাখি দেখা তো হলই না, এতদিনে ওর কথাটাও রাখতে পারলাম না।

'ছেলেবেলা', জুন ২০১৪

সম্পাদকের খাতা

ভূগোল বইয়ে নীলনদের কথা পড়েছ? নাম তো শুনেছ নিশ্চয়ই? মিশরের মরুভূমির মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নীলনদের কথা আজ পৃথিবীর সবাই জানে। কেন জানো? এই নদীই প্রাচীন কাল থেকে দুই পাড়ে গাছপালা ফলানোর জল যুগিয়ে মিশরের মরুভূমিকে সবুজ শস্যে ভরিয়ে রেখেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যে দুয়েকটি নদী আছে, যেমন মিসিসিপি, আমাজন— নীলনদ তাদেরই মতো বিশ্বের খুব বড় একটা নদী।

একবার এই নীলনদে একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। জাহাজের তিনতলার ছাদ থেকে যত দূর চোখ যায় ধু ধু মরুভূমির মধ্যে দুই পাড়ের গাছপালা, দূরে দূরে মানুষের ঘরবাড়ি, গ্রামের পথে উটের গাড়ি, নদীতে জল নিতে আসা মিশরী মেয়ে-বউ— অবাক হয়ে সব কিছু দেখতে দেখতে চলেছি,ল এমন সময় নীচে নদীর বুক থেকে একসঙ্গে অনেকের হাঁকডাক শুনে ঘোর ভাঙল। রেলিং থেকে ঝুঁকে যা দেখলাম তাতে আমার বুক শুকিয়ে গেল। অনেকগুলো ছিপনৌকোয় কারা যেন আমাদের জাহাজের পুরো একটা দিক ঘিরে ফেলছে। সরু সরু নৌকোয় দাঁড়িয়ে লম্বা চেহারার কুচকুচে কালো বেশ কিছু লোক। তারা আমাদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে কিছু বলছে। নিশ্চয়ই এরা জলদস্যু! শুধু একটাই খটকা। ডাকাত-ই যদি, হাঁক পাড়ার সঙ্গেই রঙিন আলখাল্লার মতো জামা বা গাউন পুঁটলি পাকিয়ে পাতলা পলিথিনের ছোট ব্যাগে ভরে জাহাজের ছাদে ছুড়ে দিচ্ছে কেন? আমাদের মধ্যে অনেকেই সেগুলো লুফেও নিচ্ছে। তারপর ব্যাগ থেকে বের করে আলখাল্লার মতো জামাটা পছন্দ হলে ঝুঁকে দরাদরি করে মিশরী ডলারের নোট ওই ব্যাগে ঢুকিয়েই নৌকোয় ছুড়ে দিচ্ছে। যেগুলো কেউ কিনবে না সেগুলো আবার নীচেই ফেলে দেওয়া হচ্ছে। নৌকোর লোকগুলো লুফে নিচ্ছে। দুটো-একটা প্যাকেট নৌকোর বাইরে নদীতেও পড়ছে। মরূদ্যানের লম্বা লম্বা খেজুরগাছের মতো লোকেরাও ঝুপ করে বসে পড়ে জল থেকে পলিথিনের ব্যাগ তুলে নিচ্ছে।

নীলনদের জলদস্যু ভেবে যাদের ভয় পেয়েছি তারা আসলে নীলনদের জামা-কাপড়ের ফেরিওলা। ওই যে জামাটামা জাহাজে ছুড়ে দিচ্ছিল ওগুলো হল মিশরীদের জাতীয় পোশাক— গালেবি। সন্ধেবেলা গালেবিতে সেজে জাহাজে যাত্রীদের নাচগান হবে, তাই তাদের কাছে বিক্রির আশায় এরা ছিপনৌকোয় আমাদের জাহাজ প্রায় ঘিরে ফেলেছিল।

যারা জাহাজের দোকানে মনের মতো গালেবি পায়নি বা যাদের দামে পোষায়নি, তারাই এইসব ছিপনৌকোর লক্ষ্য।

সেদিন নীলনদে আমি বুঝেছিলাম, যেটা বা যাকে প্রথম দেখে যা মনে হয় সেটাই তার আসল পরিচয় নাও হতে পারে। তারপর আরও নানা নদ-নদীতে, সাগরে-মহাসাগরে, দেশে-মহাদেশে ঘুরতে ঘুরতে এরকম অনেক শিক্ষাই আমার হয়েছে। আজও হয়েই চলেছে।

'ছেলেবেলা', ফেব্রুয়ারি ২০১৫

সম্পাদকের খাতা

গত মাসে বলেছিলাম সিরিয়ার মরুভূমিতে আরব বেদুইনদের তাঁবুতে আমার অভিজ্ঞতার কথা, এবার বলব মোঙ্গোলিয়ায় স্তেপভূমিতে মোঙ্গোলীয় যাযাবরদের তাঁবুঘরে রাত কাটাবার কাহিনি।

সে-বার মোঙ্গোলিয়ায় যেতে হয়েছিল বিশ্ব কবি-সম্মেলনের নিমন্ত্রণে। সম্মেলন শুরুর দিন মোঙ্গোলীয় ভাষায় আমার 'শাদা ঘোড়া' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানেও নাকি আমার না-থাকলেই নয়, কবি-সম্মেলনের সভাপতি সে-দেশের রাষ্ট্রপতির হাতে 'শাদা ঘোড়া'-র প্রথম কপি তুলে দেবেন, তাই আমাকেও থাকতে হবে সেখানে। তার ওপর 'মোঙ্গোলিয়া' নিয়ে একটা ভ্রমণ-তথ্যচিত্র তৈরি করার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের।

অতএব একদিন অফিস থেকে সোজা দমদম বিমানবন্দর, সেখান থেকে উড়তে উড়তে ব্যাংকক হয়ে আগেকার পিকিং, এখন যার নাম বেইজিং— সেই চিনের রাজধানী ছুঁয়ে চলে গেলাম মোঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটোর সেখানে কবি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চে বসে 'শাদা ঘোড়া' হাতে নিয়েই দেখলাম রাষ্ট্রপতি পড়তে শুরু করেছেন। কেন জানো? গল্পটা একটা ঘোড়াকে নিয়ে। তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ, মোঙ্গোলীয়দের জীবনে ঘোড়া খুব বড় ব্যাপার, বলা যায় রোজকার সঙ্গী। ঘোড়া বাদ দিয়ে মোঙ্গোলিয়ার মানুষের জীবন ভাবাই যায় না। বিশেষ করে রাজধানী-শহরের বাইরে আদিগন্ত বিশাল স্তেপ-প্রান্তরে। ঘোড়ার পিঠে বসেই মা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে— এ আমি নিজেই দেখেছি। আবার, ঘোড়ার দুধের ঘোল মোঙ্গোলীয়দের প্রিয় পানীয়। আমিও একদিন নীল আকাশের নীচে খোলা প্রান্তরে প্রচণ্ড ঠান্ডায় মোঙ্গোলিয়ার সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন উৎসব 'নাদাম'-এর ছবি তুলতে তুলতে এক গেলাস ওই ঘোল খেয়ে শীতের হাত থেকে বেঁচেছিলাম।

যাই হোক, রাজধানীতে দু'দিন নানা দেশের কবি ও কবিতা নিয়ে কাটবার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল দেশটার দূর-দূর প্রান্তে। সেখানে দিগন্ত অবধি কোথাও গাছপালা নেই, মানুষজন প্রায় চোখেই পড়ে না। মাঝে মাঝে শুধু কয়েকটা তাঁবু আর একদল ঘোড়া। এরকমই একটা জায়গায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল যাযাবরদের তাঁবুঘরে, উঁচু উঁচু এইসব তাঁবুকে ওদের ভাষায় বলে 'গের'।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে প্রাচীনকালের বিরাট পাঁচিলঘেরা বৌদ্ধমন্দির আর পাহাড়ের খাঁজে লোকের চোখের আড়ালে একটা ছোট্ট গুম্ফা দেখে সন্ধেবেলা তাঁবুতে এলাম। তাঁবুতে ঢোকবার দরজা খুব ছোট, লম্বায় দু'-তিন হাতের বেশি নয়। মাথা নিচু করে কোমর ভেঙে ভিতরে যেতে হয়।

তিনদিকে তিনটে খাটিয়ার মতো পাতা, মাঝখানে একটা আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা। আগুনের তাতে আরাম হচ্ছে, এদিকে ধোঁয়াও মস্ত একটা চোঙার মধ্য দিয়ে তাঁবুর মাথা ফুঁড়ে আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। খাটিয়া তিনটে হলেও আমাকে খাতির করে সে-রাতে পুরো তাঁবুটাই থাকতে দিয়েছে।

সেটা ছিল সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। তার মধ্যেই পথে বছরের প্রথম তুষারপাত

দেখেছি। তার ছবি তুলতে রাস্তায় নেমে মাথার চুল ও গায়ের কোট তুষারে সাদা হয়ে গেছে।

তাঁবুর ভিতরে আগুন সত্ত্বেও রাত বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শীতও বাড়তে থাকে। ঠান্ডায় গায়ের গরম পোশাক, মাথার টুপি, পায়ের মোজাসুদ্ধ মোটা কম্বলের নীচে ঢুকেছি। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। হঠাৎ দরজায় খড়মড় শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে দেখি নিচু হয়ে চুপিচুপি দু'জন তাঁবুতে ঢুকছে। এরা ডাকাত, না দস্যু? নাকি বাকি দুটো খাটিয়ার মালিক? কাঠের আগুন লকলকে শিখা হারিয়ে তখন শুধু ধিকিধিকি জ্বলছে। ফলে ঠান্ডা আরও মারাত্মক। প্রায় দম বন্ধ করে কম্বলের ফাঁক দিয়ে যা দেখলাম, তাতে নিমেষে ভয় কেটে গেল। বরং লজ্জাই পেলাম। দেখলাম, দু'জনের হাতেই বড় বড় চ্যালা কাঠ, নিভন্ত আগুনে ফুঁ দিয়ে সেই কাঠ জ্বালিয়ে রেখে তারা নিঃশব্দে চলে গেল। একটি ছেলে, আর একটি মেয়ে— দু'জনেরই মনে হল আঠারো-কুড়ি বছরের মধ্যে বয়স।

গোড়া থেকেই গুটিসুটি মেরে শুয়েছিলাম। আগুনের তাত পেয়ে যেই হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়েছি, অমনি তাঁবুর মাথার খোলা গোল ফাঁক দিয়ে মস্ত বড় একটা চাঁদ চোখে পড়ল। মনে হয় যেন যে-কোনও মুহূর্তে তাঁবুর মধ্যে ঝুপ করে খসে পড়বে!

'ছেলেবেলা', জানুয়ারি ২০১৫

সম্পাদকের খাতা

'সম্পাদকের কথা'র বদলে এবার থেকে 'সম্পাদকের খাতা'। কেন বলো তো? 'সম্পাদকের কথা' প্রায়ই কিছুটা গম্ভীর হয়, দু-চারটে উপদেশ না থাকলে ঠিক মানায় না। ছোটদের উপদেশ দেওয়া কি সহজ কথা? তাছাড়া অত সব জ্ঞান-বিদ্যাও আমার নেই। সেইজন্যই এই 'সম্পাদকের খাতা'। তোমাদের যখন যা আমার শোনাতে ইচ্ছে হবে, তা-ই শোনাব। গল্প কবিতা ছড়া ভ্রমণ— যখন যা মনে পড়বে।

যেমন, এবার বলব ফরাসিদেশে একশো বছর আগে এক ডাকাতে-খালিবাড়িতে এখনকার একটা ছোট্ট মেয়ের কবিতা লেখার কথা। সেকালের ফরাসি ডাকাতদলের আস্তানায় একালের এক ফরাসি বালিকা-কবির বাড়িতে তার মা-বাবা ভাইবোনের সঙ্গে দিনটা আমার কী যে আনন্দে কেটেছিল কী বলব!

অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছড়ানো-ছেটানো সে এক মস্ত তেতলা বাড়ি। ঘর যে কতগুলো, আমি গুণে শেষ করতে পারিনি। কোনও ঘর নিচুতে, কোনও ঘর উঁচুতে, সিঁড়ি বেয়ে এই উঠছি, এই নামছি। তাছাড়া অনেক ঘর চট করে চোখেও পড়ে না। এ-দেয়াল সে-দেয়ালের আড়ালে বা কোথাও অনেক কালের প্রাচীন গাছের ডালপালার পিছনে লুকনো সেসব ঘর।

আমাকে দেখেই বাড়ির দুই বালিকা, দুই বোন এমোলিন আর অ্যানায়েল এগিয়ে এসে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেল। এদের মাসি, এঁরাও দুই বোন, প্যারিস থেকে আমাকে তাঁর এই বোনের নিমন্ত্রণে এই ফরাসি গ্রামে নিয়ে এসেছেন। তাঁর দুই ছেলেও মায়ের সঙ্গে তাদের মাসির বাড়ি এসেছে। অনেকদিন পর চার ভাইবোন এক

সঙ্গে হয়ে সকলে আনন্দে আহ্লাদে মেতে উঠল। তাদের মায়েরাও তো দুই বোন, তাদেরও আজ আনন্দের সীমা নেই!

সবাইকে দেখছি, কিন্তু যিনি প্যারিসে গিয়ে আমাকে নেমন্তন্ন করে এসেছেন, দুই মেয়ের সেই বাবাকে তো কোথাও দেখছি না।

একে তো গ্রামীণ পরিবেশ, বাড়িময় আনন্দের ঢেউ, তার ওপর এমোলিন আর অ্যানায়েলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব ভালো লাগল। ওরা অনেকক্ষণ ধরে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, সেটা কেউ না বলে দিলেও বোঝা যায়।

অ্যানায়েলের বয়েস সাত-আট বছর। সে তার মাসির কাছে আগেই শুনেছে বিদেশি একজন কবিকে নাকি মাসি আজ তাদের বাড়ি নিয়ে আসছেন। সবাই মিলে হই-হুল্লোড়ের মধ্যে থেকে প্রথম সুযোগেই সে আমাকে তার পড়ার ঘরে টেনে নিয়ে গেল। তারপর তার খাতা খুলে চারটে কবিতা শুনিয়ে দিল, সবই তার নতুন লেখা। আমিও 'শাদা ঘোড়া'র গল্পের ফরাসি অনুবাদ কিছুটা তাকে পড়ে শোনালাম। ক্ষুদে এই ফরাসি কবির সঙ্গে ইংরিজি-ফরাসি জগাখিচুড়ি ভাষায় আবোলতাবোল কত কী যে কথা হল, সে তোমরা বুঝবে না। এক যদি সেখানে থাকতে, আমাদের দু'জনের চোখ-মুখের ভাব, হাত নাড়ানাড়ি দেখতে পেতে, তাহলে ঠিক বুঝতে পারতে।

দেওয়ালের গায়ে লাগানো সরু মই বেয়ে অ্যানায়েলের তেতলার এই ঘরে উঠতে হয়। ঘরটা নতুন আর মস্ত বড়। দেওয়ালের গায়ে সদ্য ফোটানো জানলা দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ঘন বনজঙ্গল দেখা যায়। অ্যানায়েলের সঙ্গে আমার চুক্তি হল, শীতকালে আবার এসে এ-ঘরে বসে আমি অনেক কবিতা লিখব। ও-ও লিখবে। আমরা দুজনে মিলেই কবিতা লিখব।

এর সঙ্গে আমি যোগ করলাম— কবিতা লিখব আর জানলা দিয়ে নীল আকাশ আর সবুজ বন দেখব।

অ্যানায়েল একটুখানি ভুরু কুঁচকে বলল, 'শীতকালে তো নীল আকাশ পাবে না, আর সবুজ বনও বরফে সাদা হয়ে যাবে।

নীচে নেমে এসে পুরো বাড়িটাই প্রায় দেখা হয়ে গেল, কিন্তু অ্যানায়েলদের বাবা সোলেবু সাহেব কোথায়? তাঁকে কেন দেখছি না?

ঘুরতে ঘুরতে বাড়ির পিছন দিকে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। এখানেই আজ রাতের খাওয়া-দাওয়ার টেবিল সাজানো হয়েছে। আমি ভেবেছি অনেক অতিথি আসবেন, এখন দেখছি চার ভাইবোন, তাদের মা-মাসি, অ্যানায়েলদের বাবা— কিন্তু তিনি কোথায়? বাইরের লোক বলতে শুধু আমি!

একটু দূরে মাটির ওপরে কাঠের বড় একটা তক্তা নড়তে শুরু করেছে। কী ব্যাপার? অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি।

আস্তে আস্তে তক্তার একটা দিক উঁচু হল আর সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল মানুষের একটা মাথা, ক্রমে গোটা একটা মানুষ। তার দু-হাতে পুরনোকালের খুব সুন্দর দেখতে দুটি বোতল। তাতে নাকি ফরাসি দেশের কোনও এক পাহাড়ি গ্রামের খুব দামি কালো আঙুররসের ওয়াইন আছে। অতিথির জন্য মাটির নীচে ঠান্ডা কুঠুরি

থেকে তুলে এনেছেন সোলেবু সাহেব। তার হাতে, গালে, মাথার চুলে রং লেগে আছে। কোথাও সূর্যমুখীর টকটকে হলদে রং, কোথাও ল্যাভেন্ডারের বেগুনি, কোথাও সাদা । বাড়ির কত্তামশাই নাকি সারা দুপুর বাড়ির এখানে ওখানে রং করছিলেন। বাড়িটা তো একশো বছরের পুরনো। মেরামতি, অদল-বদল, রং করারও তাই শেষ নেই! তিনি নিজে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর এ কাজ করছেন, তার আগে তাঁর বাবা-ঠাকুরদাও করেছেন। বাড়ি সারাইয়ের কাজটা কখনও মিস্ত্রির ওপর ছাড়েন না। একে তো শতাব্দীপ্রাচীন বাড়ি, তার ওপর এটা আবার ছিল ডাকাতদের পানভোজনের আস্তানা। খুব নামকরা ডাকাতের দল ছিল এই অঞ্চলে, বিশ শতকের গোড়ার দিকে। তারা ডাকাতি করতে যাবার আগে এখানে বসেই হই-হুল্লোড় করে খানাপিনা সারত।

ফরাসিদেশের সেই ডাকাতে-বাড়িতেই একশো বছর পর একটি ফরাসি বালিকা আমাকে তাঁর লেখা কবিতা শোনাচ্ছে— কথাটা ভাবলেই ছোটদের কবিতা পড়তে আর লিখতে আজও আমার মন নাচে।

'ছেলেবেলা', সেপ্টেম্বর ২০১২

সম্পাদকের খাতা

যারা গ্রামে থাকো তারা নিশ্চয়ই শীতের ভোরে খেজুর রস খেয়েছ? যারা জন্ম থেকেই শহরে থাকো তারা শীতকালে গাছ থেকে পাড়া খেজুর রসের স্বাদ কল্পনা করতে পারবে না। গাছের গায়ে ঝোলানো মাটির হাঁড়িতে সারা রাত ধরে রস জমতে থাকে, ভোরবেলা সেই রসের কলসি নামানো মাত্র সে-রস খেয়ে ছোটবেলায় আমি ভাবতাম এ বুঝি স্বর্গের দেবদেবীদের কাছে পাঠাবার জন্য।

খেজুর রস জ্বাল দিয়েই আবার গুড় হয়। অল্প জ্বাল দেওয়া নলেন গুড়, অনেকক্ষণ ধরে আগুন কমিয়ে-বাড়িয়ে জ্বাল দিয়ে ঘন দানা দানা গুড়ও হয়। আর খেজুর রসের পাটালি যা হয় তা দেখতে বিরাট একটা পূর্ণিমার চাঁদের মতো। আর খেতে? জিভে দিলে গলে যায়, মুখ সুগন্ধে ভরে যায়। সে স্বাদ-গন্ধ লিখে বোঝানো যায় না। গ্রামের যে বাড়ির উঠোনে কাঠের আগুনে রস জ্বাল দিয়ে গুড় বানানো হয় সে-বাড়ির আকাশ-বাতাস গুড়ের স্বর্গীয় গন্ধে ম-ম করে।

ছোটবেলা থেকে এই গন্ধ আর এই স্বাদ আমার চেনা। সেইজন্যই শহরের নাম করা কোম্পানির চমৎকার সব মোড়কে মোড়া দামি দামি চকোলেট খাবার ইচ্ছে হয় না। চকোলেট খেতে যে খুব খারাপ লাগে তা কিন্তু নয়, দুয়েকটা বেশ ভালোই, প্যাকেজিং দেখে তো চোখ সরানোই যায় না, কিন্তু আমার সেই গ্রামের জিরেন কাটের রস আর টাটকা রসের গুড় ও পাটালির স্বাদ এতে পাই না।

জিরেন কাটের রস কাকে বলে জানো?

পরপর কয়েকদিন গাছ থেকে রস কাটার পর কয়েকটা দিন গাছটাকে জিরোতে দিয়ে নতুন করে আবার যে রস কাটা হয় তাকেই বলে জিরেন কাটের রস। আবার, খেজুরগাছও তো আসলে কাঠই, সেই কাঠ কাটা ক'দিন বন্ধ থাকে বলে অনেকে এই

রসকে বলে জিরেন কাঠের রস। ভারি মিষ্টি সেই রস।

বাংলার অনেক গ্রামে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। শীতের দিনে যখন যে গাঁয়েই গেছি, সেখানেই শিউলিরা সক্কালবেলা খেজুরগাছ থেকে রসভরা হাঁড়ি নামিয়ে আমাকে খেতে দিয়েছে। কখনও কখনও জিরেন কাটের রসও মিলেছে।

শিউলি কাদের বলে জানো তো? যারা খেজুরগাছের বুক চেঁছে সেখানে নলের মতো একটা কাঠি গেঁথে তার নীচেই গাছের গায়ে সন্ধেবেলা হাঁড়ি বেঁধে আসে। ভোরবেলা রসভরা হাঁড়ি নামিয়ে আনে।

'ছেলেবেলা', নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৩